ত্রিপুরার গল্প-উৎস ও পটভূমিঃ পর্ব থেকে পর্বান্তর

*মিনাক্ষী পাল

ত্রিপুরার বাংলা ছোটগল্প প্রথম লেখা শুরু হয় ত্রিপুরার সাহিত্য জগতের অন্যতম পত্রিকা 'রবি'কে (১৯৮২ খ্রিঃ) কেন্দ্র করে ১৯৩০ খ্রিঃ । তাছাড়াও ছিল 'পূবালী' (১৯৩৪ খ্রিঃ), 'ত্রিপুরা' (১৯৩৪ খ্রিঃ) এবং চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নবজাগরণ' ।

'রবি' নামক ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রের ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ/১৩৪০ ত্রিপুরাব্দ) প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় । গল্পটি লেখেন অজিতবন্ধু দেববর্মা । নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সম্পাদিত 'রবি' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় অজিতবন্ধু দেববর্মার যে গল্পটি প্রকাশিত হয়,তার নাম 'দায়মুক্ত' । তারপর ঐ বছরেই চতুর্থ সংখ্যায় তাঁর আরেকটি গল্প 'রবি'তে প্রকাশিত হয় । গল্পটি হল 'প্রায়শ্চিত্ত', প্রকাশকাল ১৯৩০ খ্রিঃ,(ষষ্ঠবর্ষ চতুর্থ সংখ্যা,চৈত্র ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দ/১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) । এটি হল অজিতবন্ধু দেববর্মার 'রবি' পত্রিকায় প্রকাশিত তৃতীয় গল্প । 'রবি' পত্রিকায়ই প্রকাশিত দ্বিতীয় গল্পটি লেখেন অজিতবন্ধু ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে,গল্পটির নাম 'পরিচয়' ।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে,ত্রিপুরার গল্প রচনার সূচনা পর্বের অর্থাৎ ত্রিশ এর দশকের গল্পগুলোর মধ্যে আমরা যেন ছোট গল্পের যথার্থ স্বরূপ খুঁজে পাই না । গল্পগুলো যেন ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য মেনে রচিত হয়নি। এই গল্পগুলো পড়লে যেন নিছকই বৈঠকী ধাঁচের গল্প বলে মনে হয়। গল্পকার যেন আপনমনে গল্প বলে চলেছেন এবং পাঠক যেন মূক শ্রোতা হয়ে গল্প শুনে যাচ্ছেন । ঐ সময়কার তথা ত্রিশ এর দশকের অর্থাৎ ত্রিপুরার গল্প সাহিত্যের শুরুর দিকের গল্পগুলো যেন পাঠকের মনে কোন অনুভূতির সঞ্চার করে না । গল্পের যেখানে সমাপ্তি,পাঠকের রসাস্বাদন যেন সেখানেই থেমে যায়, যা সার্থক ছোটগল্পের বৈশিষ্ঠ্য পরিপন্থী । এ প্রসঙ্গে আমরা অজিতবন্ধু দেববর্মার দু'একটি গল্প সম্পর্কে আলোচনা করে ত্রিশ এর দশকের গল্পের চরিত্র লক্ষণ কেমন ছিল, তা তুলে ধরার চেষ্টা করব ।

'পরিচয়' গল্পটি শুরু হয়েছে সান্ধ্যকালীন চায়ের আসরের কয়েকজন প্রতিনিধিদের আড্ডাকে কেন্দ্র করে। সেই প্রতিনিধিরা হলেন, আমিয়াংশু,ব্রজেশ এবং লেখক স্বয়ং । গল্পটির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে যিনি তিনি হলেন অমিয়াংশু । যে অমিয়াংশুকে নিয়ে তাদের প্রতিদিনের চায়ের টেবিলে সান্ধ্যকালীন গল্প আসরটা জমে উঠত,সেই অমিয়াংশু তথা অমিয় দাদা যে নিজের জীবনকে এমন ভাবে গল্পজালে জড়িয়ে গল্পের রসদ জমাবে,সেটা যেন গল্প আসরের সকলের কাছে আকাশ থেকে খসে পড়ার মতোই মনে হল ।

অমিয়াংশুর সঙ্গে লেখকের পরিচয় এলাহাবাদের পথে ট্রেনে। লেখক অমিয়াংশুবাবুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

> "তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় এলাহাবাদের ট্রেনে । এমন কুৎসিত তাহার চেহারা যে মায়া হয়। তাই গায়ে পড়িয়া তার সাথে আলাপ করিয়া লইয়াছিলাম । বহু বছর পরে আবার দেখা হয় একদিন ম্যুনিসিপাল মার্কেটে। চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় নাই। সেই দিনই আনিয়া পরিচয় করাইয়া দিলাম আড্ডার সকলের সাথে। সেই হইতেই কোনদিন তাহার অনুপস্থিতি দেখি নাই ।"১

একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে,যারজন্য আসরটা তেমন জমছিল না । কয়েকজন বসে কথায় কথায় নারী প্রগতির কথায় চলে যান । তখন অমিয়াংশু বিরুদ্ধমত পোষণ করেন । তা শুনে লেখকের তর্ক করার ইচ্ছা জন্মালেও তিনি তা না করে চুপ রইলেন । ঐ আসরেরই অপর বক্তা ব্রজেশ অমিয়কে বলে উঠল —

> 'কিন্তু দাদা, এ যদি বৌদি শুনেন তা'হলে -"২

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখানে বৌদি বলতে অমিয়াংশু স্ত্রী'র কথা বলা হয়েছে । ব্রজেশের কথার উত্তরে অমিয় বলল —

> "-আশঙ্কার কিছু নেই ভাই! একঘেয়ে ঘরকন্না, প্রেমালাপের মধ্যে বেশ একটু মান অভিমানের বৈচিত্র্য টেনে আনতে মাঝে মাঝে ওকে চটিয়ে থাকি। এইতো সেদিন এই নারী প্রগতির বিরুদ্ধে বলেই ওকে চটিয়েছিলাম। জানো,সেদিন আমার সাথে কথাটি কয়নি,আমিও সাধিনি,একই বিছানায় পড়ে রইলাম-দুজনে দু'মুখো হয়ে ।" ৩

তারপর গল্প ক্রমশ সুগ্রথিত হয়ে উঠল । অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকা গল্পকার স্বয়ং গল্পের আসরে মনোযোগী হয়ে উঠলেন । এভাবে অমিয়াংশু ক্রমাগত একটার পর একটা তাঁর দাম্পত্য জীবনের মান অভিমানের কথা বলে গেলেন সেদিন । অমিয়াংশুর দাম্পত্য জীবনের নানা গল্প কথা শুনে আড্ডার সকল প্রতিনিধির ইচ্ছা জাগল বৌদি অর্থাৎ অমিয়াংশুর পত্নীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার । তাদের মধ্য থেকে একজন বক্তা যোগেন বলে উঠল —

> "সহজে যা পাবার নয়,তারজন্য করতে হয় চেষ্টা,করতে হয় বলপ্রয়োগ। তাতে দোষের কিছুই নেই । কাল দাদার ওখানে অনাহূত আমরা দলবদ্ধ হয়ে গিয়ে উপস্থিত হবো,দেখি তিনি পুলিশ ডাকেন কিনা ।"৪

নিমেষে অমিয়াংশুর মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল । পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন —

> "যথেষ্ট হয়েছে ভাই, আর নয় । আমার ওখানে তোমাদের নেমন্তন রইল । কিন্তু, কাল নয় ভাই, পরশু । এমন কুঁড়ে আমি, আজ এই দু'বছরের মধ্যে ঘরগুলোকে দুজন ভদ্রলোক নিয়ে বসানোর যোগ্য

করে তুলিনি । যা'হোক কালকের ভেতর তা আমি করিয়ে নেব । কাজের ব্যস্ততায় কালকে হয়তো নাও আসতে পারি,নেমন্তন্নটা আজকেই সেরে যাই ।"৫

এই বলে সকলের হাত ধরে যে অনুরোধ জানিয়ে গেলেন আর নেমন্তন্নে যাবার দিন সকালবেলা অমিয়াংশুবাবুর নামের একখানা চিঠি এসে পৌঁছল লেখকের হাতে । চিঠির শেষ কয়েকটি লাইন এরকম—

"বিয়ে আমি করিনি। কে দেবে আমার নিকট বিয়ে? কে বা করবে আমায় বিয়ে? আমার সারা জীবনের যে অতৃপ্ত আকাঙ্খা তারই স্বপ্ন দেখতাম, সত্য ঘটনার মতো করে তোমাদের শুনিয়ে আনন্দ পেতাম, তোমরাও পেতে । সেদিনও যখন ফুরল- বিদায়!"৬

এইভাবেই গল্পটির শেষ হল । গল্পটিতে যা আমরা দেখতে পেলাম তাহ'ল অমিয়াংশুবাবু গল্প আসর জমানোর জন্য নিজের দাম্পত্যজীবনের যে কাহিনীজাল বুনেছিলেন তা সম্পূর্ণই মিথ্যে, তাই তিনি নেমন্তন্নের দিন সকালবেলা একটি চিঠির মারফতে সকলের কাছে তার সেই গোপন সত্যটি ফাঁস করে তবেই বিদায় নিলেন ।

এই গল্পটি থেকে পাঠকবর্গ যেন ছোটগল্পের যে সকল বৈশিষ্ট্য, তা যেন পূর্ণ মাত্রায় পাননা। গল্পের শেষে যে চাবুক আঁকড়ানো সমাপ্তি, তা যদিও গল্পটিতে ছিল,তথাপি পাঠকের মনে সেই সমাপ্তি রেখাটি যেন কোনও সজোর ধাক্কা দেয় না । গল্পটি শুধুই গল্প হয়ে রইল,গল্পত্বকে ছাড়িয়ে কোন মাত্রা যোজনা করেনি ।

ঠিক তদ্রূপ আরেকটি ঘটনা ঘটেছে অজিতবন্ধু দেববর্মারই অন্য গল্প 'প্রায়শ্চিত্ত'তে । গল্পনাম, চরিত্রবিন্যাস, ঘটনাবিন্যাস, ক্ল্যাইম্যাক্স সবই আছে, কিন্তু রসাস্বাদনে যেন ব্যাঘাত ঘটল পাঠকের । গল্পটি যেন গল্পই হয়ে উঠতে পারল না ।

গল্পটির শুরুতেই রয়েছে রণক্ষেত্রের চিত্র । যেখানে প্রতিপক্ষ রাজ্যের রাজপুত্র আজয়াদিত্যের করুণা'তে বিরোধী রাজ্যের রাজপুত্র বিজয়াদিত্যের প্রাণরক্ষা পেয়েছিল এবং ঐ ঘটনাকেই কেন্দ্র করে দুই দেশের রাজার মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হয় তলোয়ার দিয়ে বুকচিরে রক্ত বের করে অপর জনের রক্তে মিশিয়ে । সেই থেকে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর হতে লাগল ।

তারপর মাঝখানে বেশ কিছুদিন কেটে গেল দুই রাজার ব্যক্তিগত কর্মব্যস্ততায়,কাজেই সাক্ষাত হয়নি দু'জনের পাঁচ বছরের মধ্যে । প্রসঙ্গাত আরেকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োগন, যখন তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল তখন দু'জনেই রাজপুত্র ছিলেন,এই দীর্ঘ কয়েক বছরে দু'জনেই রাজা হয়ে রাজকার্য নির্বাহে ব্যস্ত,কাজেই আগের মতো যখন ইচ্ছে ঘোড়ার পিঠে চেপে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে থাকলেও রাজকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে তা যেন আর হয়ে উঠছিল না ।

যাইহোক বিজয়াদিত্যের মনে একদিন খেয়াল চাপল ছদ্মবেশ ধারণ করে বন্ধুর ওখানে ভ্রমণ করতে করতে উপস্থিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে বন্ধুকে তাক্ লাগাবেন । যথারীতি তিনি বেরিয়ে পড়লেন মন্ত্রীর হাতে রাজ্যের দেখাশুনার ভার দিয়ে এবং মূল্যবান কিছু হীরে জহরত সঙ্গে নিয়ে ।

ওদিকে রাজার ঘোড়াটা যখন ছুটতে ছুটতে মাঠের পর, জঙ্গালের পর জঙ্গাল পেরিয়ে একটা নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে।আকাশে চাঁদ, নদীর তীরে সবুজ ঘাস, মৃদু-মন্দ বাতাস-রাজার বড় লোভ হল। ভাবলেন রাতটা ওখানেই কাটিয়ে সকালে আবার ছুটবেন ঘোড়াকে নিয়ে ।

বল্গাশুদ্ধ ঘোড়াটকে ছেড়ে দিয়ে তিনি ঘাসের উপর আপনার উত্তরীয়টা পাতলেন এবং তার উপর আপন ক্লান্ত দেহটি ছেড়ে দেবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে । যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেক রাত । সমস্ত জগত সুসুপ্ত । এমনি নির্জ্জনক্ষণে এক শ্বেতবস্ত্র পরিহিত বৃদ্ধের গলার স্বর বিজয়াদিত্যের কানে এল ।বৃদ্ধ ধীরে ধীরে রাজার পাশে এলেন এবং রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি ক্ষত্রিয় তনয় কিনা । রাজা সহসা বিস্মিত হলেও পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বৃদ্ধের কথার প্রত্যুত্তর দিলেন । নিজের পরিচয় গোপন করতে চাইছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ গোপন করতে পারলেন না,কারণ বৃদ্ধ রাজার চেহারা দেখেই ছদ্মবেশ ধারণকরা সত্ত্বেও বুঝে নিতে পেরেছিলেন তিনি নিশ্চয় রাজপুত্র ।কাজেই বৃদ্ধের কাছে বিজয়াদিত্য রাজা পরিচয়ে পরিচিত নাহয়ে রাজপুত্র হিসাবে পরিচিত হলেন ।

ক্রমে তাঁদের গল্প জমে উঠল । প্রসঙ্গাক্রমে বিজয়াদিত্য বন্ধু অজয়াদিত্যের কথা বৃদ্ধকে বললেন। তিনি যখন অজয়াদিত্যের স্বভাবের বর্ণনা দিচ্ছেন, তখন তা শুনে বৃদ্ধ বলে উঠলেন-

"তোমার বন্ধু হয়তো কাউকে ভালবাসে,কিন্তু ভালবাসার ধনকে সে পায়নি ।" ৭

কারণ এমন স্বভাবের অর্থাৎ অজয়াদিত্যের মতো স্বভাবের লোক নিশ্চয়ই প্রেমে ব্যাথা পেয়েছে । তাই তিনি এমনভাবে গান রচনা করতে পারেন, গাইতে পারেন । তাছাড়া জ্যোৎস্নারাতে না ঘুমানো, গানের পর গান করা, নয়তো চুপ করে একাকী ছাঁদে দাঁড়িয়ে থাকা বা বাগানে পায়চারী করা বা ঐ সময়টিতে কারো সঙ্গ পছন্দ না করা-এসবই ধোঁকা খাওয়া প্রেমিকের চরিত্রের স্বরূপ । সেই প্রসঙ্গে বৃদ্ধ আরেকটি কথাও বললেন-

"তোমার বন্ধু যে ঠিকই কারো প্রেমে পড়েছে, একথা তো আমি জোর করে বলছি নে । তবে সাধারণত ওরকমই হতে দেখা যায়।আর আমি নিজেও একজনের কথা জানি কিনা ।"৮

এই বলে তিনি এক রাজার কাহিনী বল্লেন,যিনি বৃদ্ধের কন্যাকে খুব ভালবাসতেন,কিন্তু বৃদ্ধের কন্যা সেই রাজাকে কখনো দেখেননি ।সেই রাজা গোপনে কোথাও বৃদ্ধের কন্যাকে দেখেছিলেন এবং বৃদ্ধের কাছে কন্যার

পাণিগ্রহনের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন । কিন্তু,বৃদ্ধ তথা রাজ্যচ্যুত রাজা প্রথমটায় রাজী ছিলেন না, কারণ অন্যদেশের এক রাজার পুত্রের সঙ্গে বৃদ্ধের কন্যার বিয়ের আলাপ চলছিল এবং ঐ দেশের রাজা অর্থাৎ যার সঙ্গে বৃদ্ধের কন্যার বিবাহের আলাপ চলছিল সেই রাজকুমারের পিতা বৃদ্ধের বন্ধু ছিলেন,যখন বৃদ্ধ রাজা ছিলেন। কিন্তু, পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক ঐ রাজার ইচ্ছেটা যেন প্রবল ছিল ঐ বন্ধুপুত্রের চেয়ে । কাজেই বৃদ্ধ সম্মতি দিয়েছিলেন পাণিগ্রহণে।কথাটা বৃদ্ধ রাণীকে জানাবেন ভাবছিলেন,এমনসময়ই ঘটে গেল বৃদ্ধের জীবনের নাটকীয় বাঁক। ঘটনাচক্রে তিনি রাজ্য সিংহাসন হারালেন এবং শত্রুর আক্রমন থেকে ত্রাণ পেতে স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে পালিয়ে চলে এলেন ।

তারপর দীর্ঘদিন পরে বৃদ্ধ মন্ত্রীর ছেলের মুখ থেকে পাওয়া সংবাদে জানতে পারলেন তার সঙ্গে নাকি কোথায় ঐ রাজার দেখা হয়েছিল বছরখানেক আগে । সে আরও জানায়, তখন তিনি বিয়ে করেননি । বলাবাহুল্য সম্ভবত বৃদ্ধের কন্যাই তার প্রতীক্ষার কারণ এবং ঐ রাজা নাকি দেখতেও অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন । তখন বিজয়গুপ্ত বৃদ্ধের নিকট থেকে ঐ রাজার নাম ও রাজ্যের কথা জানতে চাইলে বৃদ্ধ বলেন-

"তাই যদি জান্‌তাম তা হলে কি আর এতদিনে তাকে খুঁজে বের নাকরে থাকি ?" ৯

তখন বিজয়গুপ্ত আরও বলেন সেই মন্ত্রীপুত্র তার ব্যাপার কিছু জানে কিনা ।তখন রাজাকে বৃদ্ধ বলেন-

"জেনে আসলে তো হত-ই ।আমাদেরও কি রকম গাফিলতি দেখো-মেয়ে বিয়ে দেবো বলে ওকে কথা দিয়েছিলুম, কিন্তু নামটা পর্যন্ত জানা হয়নি । আমার মনে হয় বিধাতার অভিপ্রায় নয় যে, ওর সাথে আমার মেয়ের বিয়ে হয় ।" ১০

তারপর বিজয়াদিত্য বৃদ্ধকে কত বছর থেকে তারা সেখানে আছেন জানতে চাইলে বৃদ্ধ যখন তিন বছর বল্লেন, তখন বিজয়াদিত্য যেন আরেকটু নিশ্চিত হলেন । কারণ, অজয়াদিত্যের সঙ্গে বিজয়াদিত্যের পরিচয় পাঁচ বছরের । এমন যদি কোন প্রেমের ঘটনা অজয়াদিত্যের জীবনে থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তা বিজয়াদিত্যকে বলতেন-এরকম বিশ্বাস বিজয়াদিত্যের । যাইহোক, ক্রমে প্রভাত হয়ে এল এবং বৃদ্ধের অনুরোধে বিজয়াদিত্যে বৃদ্ধের কুটিরে দুপুরের আতিথ্য গ্রহণ করলেন এবং বৃদ্ধের কন্যাকে দেখে তিনি বৃদ্ধকে কিছু বলতে চেষ্টা করলেন তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে,কিন্তু বলেও যেন বলতে পারছিলেন না । তখন বৃদ্ধ তার এই ইতস্তত মাটির দিকে চাহনি দেখে বললেন-

"তুমি কি আমার কন্যার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাও?" ১১

তখন বিজয়াদিত্য যেন কিছুটা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে নিজের মনের বাঞ্ছাটি জানালেন ।বৃদ্ধের সঙ্গে কথোপকথনকালে বিজয়াদিত্যের পিতৃপরিচয়সূত্রে বেরিয়ে গেল যে, যে রাজার পুত্রের সঙ্গে বৃদ্ধের কন্যার বিয়ের কথা

ছিল, সে আর কেউ নয় বিজয়াদিত্য স্বয়ং ।রাজা শৈলাদিত্য হলেন বিজয়াদিত্যের পিতা যিনি বৃদ্ধের রাজত্বকালে বন্ধু ছিলেন ।তারপর যথারীতি বিবাহ সম্পন্ন হল গান্ধর্ব মতে এবং কন্যাকে বিজয়াদিত্যের হাতে অর্পণ করে বৃদ্ধ যেন নিশ্চিত হলেন ।

এদিকে বিজয়াদিত্য রাজ্যে ফিরে এসে প্রজাদের একটি ভোজ দিলেন বিবাহ উপলক্ষে ।রাজা অজয়াদিত্য বন্ধুর বিয়ের খবর পেয়ে গোপনে দেখা দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে বন্ধুকে তাক্ লাগাবেন ভেবে ঐখানে উপস্থিত হলেন । কিন্তু, তিনি গিয়ে যা দেখলেন তা'তে তাঁর জীবনের সমস্ত শান্তি মুহূর্তে কর্পূরের মতো উবে গেল । বিজয়াদিত্যের পার্শ্বে সিঙ্ঘাসনে আসীনা নারীর মুখের সেই তৃপ্তি তাঁর হৃদয়ের একটা রগ যেন ফট করে টেনে ছিঁড়ে দিল; সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি-জয় মহারাজা বিজয়াদিত্যের জয়, জয় মহারাণীর জয়-তাঁর কানে ব্যঙ্গ চীৎকারের মতো বাজল ।

বিবর্ণমুখে ঘোড়ায় চেপে বনজঙ্গাল,কাটা গাছ,বৃক্ষলতা পেরিয়ে ক্ষতবিক্ষত শরীরে সন্ধ্যার আগে রাজ্যে পৌঁছলেন এবং মন্ত্রী তাঁর এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন-

> "রক্ত রক্ত মন্ত্রী, রক্ত-বিজয়াদিত্যের রক্ত ।আমার গায়ে যা'ছিল সব আজ বেরিয়ে গেছে । আজ থেকে সে আমার বন্ধু নয়, শত্রু-আমার পূর্ব পুরুষদের নিকট তা'র পূর্বপুরুষেরা যা ছিল তার চাইতেও বেশী ।" ১২

তারপর রাত্রি যখন গভীর, তখন তিনি তার সেনাসন্ততি নিয়ে প্রবেশ করলেন বিজয়াদিত্যের রাজ্যে । ঘরে আগুন জ্বলে উঠল,চারিদিকে অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা,চীৎকার আর চীৎকার ।বিজয়াদিত্য আর রাণীকে বন্দী করা । মুহূর্তে বিজয়াদিত্যের রাজপ্রাসাদ পুড়ে ছারকার, রইল শুধু ইটের বিরাট স্তুপ ।

রাজা অজ্যাদিত্য দাঁড়িয়েছিলেন সেই বাগানে,যেখানে তারা বন্ধুত্ব করেছিলেন । মন্ত্রীকে অজয়াদিত্য হুকুম দিলেন একটা বর্শা সমেত বিজয়াদিত্যকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে আর রাণীকে মুক্ত করে দিতে,কিন্তু এদিকে আসতে না দিতে । বিজয়াদিত্য এলেন। তাঁর মুখের করুণ 'বন্ধু' সম্বোধনটি অজয়াদিত্যের চিত্তকে খানিকক্ষণ বিচলিত করলেও তিনি পরক্ষণেই নিজেকে সামলে বললেন-

> 'না না, আর বন্ধু নয়, শত্রু মহাশত্রু ।' ১৩

তথাপি বিজয়গুপ্ত একটিবারের জন্য তার অপরাধটি জানতে চাইছিলেন বন্ধু অজয়াদিত্যের কাছে। তিনি অজয়াদিত্যের মুখ থেকে বেরিয়ে আসল -

> 'হীন স্বার্থপর প্রতারকের কথার উত্তর দিতে অজয়াদিত্য ঘৃণাবোধ করে।' ১৪

যাইহোক, শুরু হল একে অপরের বক্ষে বর্শা ছুঁড়ার পালা আবার সেই বাগানে দাঁড়িয়ে,যেখানে তারা একে অপরের বক্ষের রক্তে রক্ত মিশিয়ে বন্ধুত্ব করেছিলেন । হঠাৎ করে অজয়াদিত্যের কণ্ঠ থেকে অঙ্ক গোনার অর্থাৎ এক দুই করে তিন গোনার আওয়াজ স্তব্ধ হতে লাগল। তার মনে পড়ে গেল সেই বন্ধুত্ব স্থাপনের দিনের কথা,তার হাত থেকে বর্শা খসে পড়ে গেল এবং দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বিজয়াদিত্যের দিকে । বিজয়াদিত্য বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং কিছুই বুঝতে নাপেরে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন ।অজয়াদিত্য এগিয়ে এসে বন্ধুকে আলিঙ্গান করলেন এবং আবেগে দরদর করে তাঁর অশ্রু ঝরে পড়ল বিজয়াদিত্যের গায়ে। বিজয়াদিত্য মর্মাহত হলেন এবং কম্পিত কণ্ঠে কেবল ডাকলেন-বন্ধু । অজয়াদিত্য কোন উত্তর দিতে পারলেন না,শুধু আরো নিবিড় আর গভীর করে বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ।সপ্তাহখানেক পরে বিজয়াদিত্যের কাছে খবর এলো মহারাজা অজয়াদিত্য আর ইহলোকে নেই,পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে এবং অজয়াদিত্যের সাক্ষরিত একটি কাগজ পাওয়া গেছে,যেখানে বিজয়াদিত্যকে তিনি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে গেছেন ।বন্ধুকে ভুল বুঝে তার রাজ্য ছারকার করার প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন অজয়াদিত্য । এখানেই গল্পনামের সার্থকতা

এই যে ' প্রায়শ্চিত্ত ' গল্পটি, এই গল্পটি থেকে আমরা ছোটগল্পের উপাদান যতটা না পাই, তার থেকে যেন ট্র্যাজিক উপাদান বেশী পাই । অজয়াদিত্যের মৃত্যু যেন পাঠক চিত্তে ক্যাথারসিসের জন্ম দেয় । অজয়াদিত্যের মৃত্যু যেন পাঠকচিত্তে ক্যাথারসিসের জন্ম দেয়, অজয়াদিত্যের মৃত্যুতেই যেন গল্পটি থেমে গেল, এনিয়ে কোন অনুরণন চলল না পাঠকচিত্তে ।তাই, এই গল্পটিকে আমরা কি নিছক গল্প বলব,না ছোটগল্প বলব !-এ জিজ্ঞাসা থেকে যায় বিশ্লেষকদের কাছে ।

'রবি' নামক সাহিত্যপত্রে গল্প প্রকাশের প্রায় সমসাময়িক সময়ে ‘ত্রিপুরা’ নামক একটি সাময়িক পত্রে গল্পচর্চা চলত । কিন্তু, ঐ পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল খুবই সীমিত ছিল বলে এর গল্পগুলো আমাদের হাতে এসে তেমনভাবে পৌঁছায়নি। তবে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে শুধুমাত্র ঐ সময়ের ‘ত্রিপুরা’ পত্রিকার লেখকদের নাম জানা গেছে । ‘ত্রিপুরা’ পত্রিকায় গল্প লিখেছিলেন মুরারী ঘোষ, বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেশ্বর মিত্র এবং শৈলেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী । ১৯৮৫ সালে সুখময় ঘোষ এবং বিকচ চৌধুরীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত গল্প সংকলন ‘পাঁচ দশকের গল্প’-তে রাজেশ্বর মিত্রের ‘স্যামসন্ বক্স’ গল্পটি পাওয়া যায় । গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ‘ত্রিপুরা’ পত্রিকার কোন এক সংখ্যায়।

'স্যামসন্ বক্স' গল্পটি একটি ভূতের কাহিনী আশ্রিত গল্প । স্যামসন্ হল কেন্দ্রীয় চরিত্র, যাকে কেন্দ্র করেই গল্প কাহিনী রচিত । সে ছিল দেশীয় খৃষ্টান, মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনরত প্রাক্তন ছাত্র । কলেজ হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করত । ছয় বছরের জায়গায় বারো বছর পড়েও যখন পাশ করতে পারেনি, তখন অগত্যা বিয়ে করে বাড়ী চলে গেল এবং স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে গেল তার একটি নিত্যসহচর অস্থিপূর্ণ বেতের বাক্স ।

এই বাক্সটি বহুদিন ষ্টোর রুমে ছিল । মেড্ক্যাল কলেজে নতুন কিছু ছাত্র ভর্তি হয়েছে । তাদের হাড়গোড়ের বাক্স দেখে বায়াড়া ভাবল,স্যামসনের ঐ বাক্সটি এদের কাছে দিলে কাজে লাগতে পারে ।একদিন বাক্সটি বেয়াড়া অনিলকে এনে দিল । সুদৃশ্য বাক্সটি পেয়ে অনিল খুবই আনন্দিত । সে ভাবল নতুন হাড়ের সেটের দাম তো কম নয়, কাজেই এটাতে যদি কাজ চলে যায় তো মন্দ কি! সুতরাং নিশ্চিতচিত্তে সে অস্থিগুলো ব্যবহার করতে লাগল।

অনিল হল মেডিক্যাল কলেজের নবাগত ছাত্র । পড়াশুনায় খুবই ভাল । ইন্টারে জলপানি নিয়েই মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছিল এবং ভালোই রেজাল্ট করছিল । কিন্তু, স্যামসন্ বাক্সটি আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটতে লাগল । কিছুই যেন সে পড়ে মনে রাখতে পারে না, আর সবই যেন গুলিয়ে যেতে লাগল তার কাছে । বাৎসরিক পরীক্ষার কিছুদিন আগে সে ওয়ার্ডেন সাহেবকে জানাল এবার বোধ হয় তার ভাগ্যে আর পাশ নেই । তিনি উচ্চহাস্যের সঙ্গে কথাগুলি উড়িয়ে দিলেন আর তাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন । কিন্তু, হতাশ হয়ে অনিল বলল —

'কি করে হবে স্যার, অ্যানাটমির কিছুই যে মনে থাকছে না?' ১৫

সাহেব সাহস দিয়ে বল্লেন,পড়ার সময় হাড়গুলো ভালোকরে পরীক্ষা করে যেতে,তাহলে এমনি সব মনে থাকবে । তিনি তাকে হাড়ের সেটগুলো আছে কিনা জিজ্ঞেস করায় উত্তরে অনিল যখন বলল সে কেনেনি,বেয়াড়া তাকে ষ্টোররুম থেকে একটি সেট দিয়েছিল,সেটাতেই চলছে ; তখন ওয়ার্ডেন সাহেব সেই বাক্সের মালিকের ফেলের ঘটনাটা মজা করে অনিলকে বলছিলেন এবং আরও বলেন যে ঐ ফেল করানো ভূতটা নিশ্চই ঐ অস্থির বাক্সে রয়েছে,তাই হয়তো তার কিছু মনে থাকছে না । ব্যাপারটা প্রথম দিকে সকলের কাছে শুধুমাত্র মজার ও হাস্যকর হলেও পরবর্তীকালে এটিই চিরন্তন সত্য হয়ে দাঁড়াল । স্যামসনের অ্যানাটমির ঐ বাক্সটিতে ভূতের হাতছানি ছিল বলেই বাক্সটি যার কাছে যায়,তারই একই অবস্থা,অনিলের মতো তারও কিছুই মনে থাকে না অ্যানাটমির । অনিল বাক্সটি ত্যাগ করে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেল ঠিকই কিন্তু অনিলের ঐ রোগটি স্যামসন্ বাক্সের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অন্যের শরীরে যেতে শুরু করল।

অবশেষে বিজনবাবু সদম্ভে স্যামসন্ বাক্সকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, তিনি বাক্সটিকে পরীক্ষা করতে চান । সকলেই আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'করুন' । তবে কী করে করবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন —

'দেখো আজ বিকেলে আমাকে দেশে যেতেই হবে । তোমাদের স্যামসন বাক্স যদি আটকাতে পারে তবেই জানবো তোমরা যা বলো তা ঠিক ।'১৬

এ প্রসঙ্গে গল্পটির বর্ণনাভঙ্গী সম্পর্কে একটি কথা না বললেই নয় । গল্পটির শেষ পরিচ্ছেদে অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক প্রথম পরিচ্ছেদের স্যামসন্ বাক্সটিকে নিয়ে যে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল,তারই রেশ টেনে যখন বললেন —

'ব্যাপার যখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে তখন আমাদের বিজনবাবু সদম্ভে স্যামসন্ বাক্সকে চ্যালেঞ্জ করিলেন । তাঁহার শোচনীয় পরাজয়ের কাহিনী বলিয়াই গল্প শেষ করিব ।'১৭

এই যে 'গল্পটি শেষ করিব' কথাটি শুনে যেন মনে হচ্ছে লেখক কোন বৈঠকে আড্ডা দিতে বসেছেন পাঠকদের নিয়ে, যেখানে গল্পটি তিনি কোথা থেকে শুরু আর কোথায় শেষ করবেন তা পাঠকদের আগেভাগেই বলে দিচ্ছেন । গল্পটি পড়লে আমাদের বঙ্কিমের বৈঠকী আলাপের কথা মনে করিয়ে দেয় কিনা!

তাছাড়া যে বিজনবাবুর কথা লেখক উত্থাপন করেছেন,সেই বিজনবাবুর পরিচয়টি তিনি অবলীলায় এড়িয়ে গেছেন,যা একজন সার্থক ছোটগল্প রচয়িতার গল্প রচনার পরিপন্থী । পাঠককে বাধ্য হয়ে বিজনবাবুর পরিচিতি সম্পর্কে একটি মনগড়া চিত্র আঁকতে হবে এই বলে যে,এই বিজনবাবু সম্ভবত হোস্টেলের বা কলেজের একজন কর্মচারী হবেন । যাইহোক, বিজনবাবু যখন ছাত্রদের চ্যালেঞ্জ দেন, তার পরবর্তী ঘটনাতে দেখা যায় অনেক ছাত্র বলে যে বাক্সটি লেখাপড়ার ব্যাপারে নিজের শক্তির পরিচয় দেবে,কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে নয় । তখন অনিল বলে উঠে —

'কুছ পরোয়া নেই বিজনবাবু,স্যামসন্ আপনার সব কাজই নষ্ট করতে পারে । এসো তো বাবা স্যামসন্ চু-চ্চঃ ।' ১৮

একটা চুম্ জুড়ী কেটে অনিল বাক্সটি বিজনবাবুর ঘরে রেখে দিল । যথা সময়ে বিজনবাবু মোটরযোগে হাবরা যাত্রা করলেন । কিন্তু, আশ্চর্য ব্যাপার হঠাৎ কিছুক্ষন পর দেখা গেল বিজনবাবু ফিরে এলেন । ঘটনাটি কী ঘটেছে জিজ্ঞেস করায় উত্তরে তিনি বলেন —

'প্রথমতঃ কলেজ ষ্ট্রিটের মোড়েতে কিছুক্ষন দাঁড়াতে হলো । বেজায় ভীড়, তারপরে খানিকটা গিয়ে ভয়ঙ্কর গোল্মাল,মুসলমানদের কই পরবে হিন্দুদের সঙ্গে বিষম দাঙ্গা বেধে গিয়েছে । ট্যাক্সি

ফেরাবে এমন সময় সোডার বোতলের গুলি এসে লাগল ড্রাইভারের কপালে, তারপর রক্তারক্তি কাণ্ড । পুলিশ এসে জুটলো,সেইসব মিটিয়ে তবে আসচি ।' ১৯

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি থামলেন। তাঁর গল্প নিঃস্তব্দ দাঁড়িয়ে সেই স্যামসন্ বাক্সটি শুনছিল এবং যেন লৌনভাবে হাসতেছিল ।

''রবি'' সাহিত্যপত্রের প্রথমবর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (অর্থাৎ ১৯২৭খ্রিঃ/১৩৩৪ত্রিপুরাব্দ বা ১৩৩৭বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে) জ্যোতিপ্রভা দত্তের 'স্নেহের জয়' গল্পটি স্থান পায় ।গল্পটিতে স্নেহ জিনিষটা যে কত বড়, স্নেহই যে পারে সকল বাঁধা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যেতে, সেটাই গল্পকার পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছেন। অপর্ণা তার স্বামী নরেন্দ্র এবং তাদের একটি চার বছরের পুত্রের বিয়োগের চিত্র নিয়েই গল্পজালের সূচনা । কিন্তু, অপর্ণার এই পুত্র হারানোর সমস্ত দুঃখ যেন সে ভুলে গিয়েছিল জা'পুত্র শিশু অমিয়কুমারকে পেয়ে। অপর্ণার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করে দিয়ে একদিন শশীমুখী ও তার স্বামী গ্রামের মড়কের দিনে প্রাণ হারায় । সেই থেকে কাকীমার কোলেপীঠেই মানুষ অমিয় । অপর্ণা আদর করে তাকে শান্তি বলে ডাকত । সম্ভবত,পুত্র হারানোর বেদনা থেকে শান্তি দিয়েছিল এই শিশুপুত্র অমিয়, সেজন্যই বোধহয় তাকে শান্তি নামে ডেকে আরও শান্তি পেত শশীমুখীর জা অপর্ণা ।

শান্তি এম্ এ পাশ করেছে । নরেন্দ্রবাবুর পছন্দমত এক প্রবীন উকিলের সুশিক্ষিতা সুন্দরী কন্যার সঙ্গে অপর্ণার অঞ্চলের নিধি শান্তি কুমারের বিয়ে হল । বধূর সুন্দর মুখখানি দেখে অপর্ণার চক্ষু সার্থক হল । শান্তির শ্বশুর ব্রজমোহনবাবু ঢাকা বারে প্রাক্টিস্ করতেন, কন্যার বিয়ে উপলক্ষে কলকাতা আসেন এবং যাবার সময় কন্যা ও জামাতাকে সঙ্গে করে দেশে ফিরেন । ওখানে গিয়ে জামাতাকে একটি কলেজে নিযুক্তির প্রস্তাব দিলেন অধ্যাপনার কাজে । কিন্তু, প্রথমাবস্থায় শান্তি কাকীমাকে ছেড়ে এতদূরে থাকতে সম্মতি না দিলেও শেষ পর্যন্ত চাকরী ও স্ত্রীর ভালবাসাকেই মূল্য দিয়ে ঢাকা কলেজের অধ্যাপনার কাজে লেগে গেল । ক্রমাগত কাকীমাকে ভুলে যেতে লাগল অমিয়। এদিকে দুঃখকষ্টে অপর্ণার বারবার রণুর শোক উথলিয়া উঠল । কারণ, নিজের রক্ত হয়তো এতটা বেইমানি করতো না,যতটা জা'পুত্র করেছে ।এদিকে অমিয়কুমার (শান্তি) এখন সুউপার্জনশীল । পাছে বৃদ্ধ কাকা-কাকীমাকে অর্থসাহায্য করতে হয় এই ভয়ে কূটবুদ্ধি শ্বশুর ব্রজমোহনের পরামর্শমত পত্রলেখাও বন্ধ করে দিয়েছে ।

কিছুদিন পর অমিয়ের একটি পুত্র হল, নাম সুধাংশু । একদিন অমিয় কলেজের ছুটির পর বাড়ি এসে দেখে পুত্রের খুব জ্বর, ক্রমশ তা বেড়েই চলেছে । প্রথম অবস্থায় গাফিলতির কারণে ডাক্তার ডাকা হয়নি । তিন চারদিন পর

যখন ডাক্তার এল, তখন ডাক্তার স্পষ্ট জানিয়ে দিল বাচ্চাটির জীবনের আশা কম,কারণ নিউমোনিয়া হয়েছে তাই ঔষুধ কাজ করছে না ।নিমেষে কাকীমার কথা মনে পড়ল অমিয়ের ,আর মনে মনে কেঁদে কেঁদে বলল-

'কাকীমা তোমাকে কাঁদাইয়াছি তাই, আমার এই শাস্তি, তবে বুঝি তোমার কোলে পৌঁছাইয়া দিলেই আমার সুধা ভাল হইবে।' ২০

মনকে শক্ত করে স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে নিয়ে ছুটে চলে গেল কাকীমার কাছে । কাকীমার কোলে পুত্রকে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে কাকীমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল । কাকীমা দু'জনকে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন —

'ওরে আমার পাগল ছেলে-মেয়ে,মার কাছে আবার ক্ষমা কিরে? মা কি কখনও সন্তানের উপর রাগ করতে পারে?' ২১

যে খোকা সুধাংশুকে ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে গেল রোগীর জীবনের কোন আশঙ্কাই নেই । সেই খোকা তখন শান্ত হয়ে ঠাকুরমার কোলে নিশ্চিত হয়ে ঘুমোচ্ছিল ।

উপরোক্ত গল্পগুলো ছাড়াও 'রবি'তে বেশ কিছু রূপকথাধর্মী বাংলা গল্প প্রকাশিত হয়েছিল । যেমন-দীনেশ কুমার রায়ের 'নিষ্কৃতি' ('রবি' ।১ম বর্ষ ।১ম সংখ্যা), যতীন্দ্রমোহন গুপ্তের' কোল ঠাকুর দাদার রূপকথা' (রবি ।২য় বর্ষ ।২য় সংখ্যা ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ), ত্রিগুনা নন্দরায়-'তাজমহল'('রবি' ।৪র্থ বর্ষ ।১ম সংখ্যা,১৯২৮খ্রিঃ), শ্রী অরুন-'যোবন জাগরন' ('রবি' ।৪র্থ বর্ষ ।২য় সংখ্যা ১৯২৮), শ্রী অরুনকুমার সেন-'দুঃখের কথা' ('রবি' ।৪র্থ বর্ষ । ৩য় সংখ্যা ১৯২৮ খ্রিঃ), শ্রী অরুন-'শুভ গ্রাম'('রবি' ।৪র্থ বর্ষ।৪র্থ সংখ্যা), শ্রী অরুন কুমার সেন-'শেষের ডাক' ('রবি' ।৪র্থ বর্ষ।৪র্থ সংখ্যা), ললিত কিশোর দেববর্মা — 'ফুলের মরন', গোলাপ দেবীর-'অজগর সাপের গল্প' ।

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে 'পূবালী' নামে একটি সাময়িকপত্র আত্মপ্রকাশ করে । তাতে গল্প লেখেন সতীশ দেববর্মা-'কেরানীর অপরাধ' এবং বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য -'মায়াপুরী' । 'পূবালী' পত্রিকার লেখকদের গল্প আমাদের হাতে এসে তেমনভাবে পৌঁছায়নি, কেবলমাত্র তথ্যসূত্রে গল্পকারদের নাম ও গল্পনাম জানা গেছে ।

ত্রিপুরার বাংলা গল্প সাহিত্যের শুরুর দিকের যে ক'জন গল্পকারের গল্প আমরা আলোচনা করলাম,তাতে যেন আমরা সার্থক ছোটগল্পের সন্ধান পাইনি । তাছাড়া গল্পগুলোতে ত্রিপুরার বিশেষ কোন বৈশিষ্ঠ্য ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়নি,গল্পগুলোতে নেই কোন বিচিত্র রসের সন্ধান ।

গল্পের গুনগতমান ত্রিশ এর দশকের ত্রিপুরার বাংলা গল্পে নিম্নমানের ছিল। গল্প পরিসর,ভাষা,রসবোধ,গল্পজাল এমনকি পাঠকের দীনতা ইত্যাদি নানা কারণহেতু তখনকার অর্থাৎ শুরুর দিকের গল্প

এতটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেনি । গল্প তার সার্থক অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি তখন এবং পাঠক হৃদয়ে তাই স্থান করে নিতে পারেনি গল্প কবিতার মতো । কবিতাই যখন ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য জগতে একাধিপত্য স্থাপন করে বেড়াচ্ছিল । তাই পাঠকদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হল ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যজগতের সার্থক ছোটগল্পের জন্য । আর,এই অধীর আগ্রহমিশ্রিত প্রতীক্ষার অবসানও ঘটল একদিন ।

তথ্যসূত্রঃ

১। ঘোষ সুখময় ও চৌধুরী বিকচ সম্পাদিত, ‘‘পাঁচ দশকের গল্প’’, ত্রিবেগ প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃঃ ২ ।

২। ঘোষ সুখময় ও চৌধুরী বিকচ সম্পাদিত, ‘‘পাঁচ দশকের গল্প’’, ত্রিবেগ প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃঃ ১ ।

৩। ঘোষ সুখময় ও চৌধুরী বিকচ সম্পাদিত, ‘‘পাঁচ দশকের গল্প’’, ত্রিবেগ প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃঃ ১ ।

৪। ঘোষ সুখময় ও চৌধুরী বিকচ সম্পাদিত, ‘‘পাঁচ দশকের গল্প’’, ত্রিবেগ প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃঃ ২ ।

৫। ঘোষ সুখময় ও চৌধুরী বিকচ সম্পাদিত, ‘‘পাঁচ দশকের গল্প’’, ত্রিবেগ প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃঃ ৩ ।

৬। ঘোষ সুখময় ও চৌধুরী বিকচ সম্পাদিত, ‘‘পাঁচ দশকের গল্প’’, ত্রিবেগ প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃঃ ৩ ।

৭। নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সম্পাদিত "রবি' সাহিত্য পত্র, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ-২৩৩

৮। নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সম্পাদিত "রবি' সাহিত্য পত্র, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ-২৩৩ ।

৯ ।নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সম্পাদিত "রবি' সাহিত্য পত্র, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ-২৩৪ ।

১০। নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সম্পাদিত "রবি' সাহিত্য পত্র, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ-২৩৪ ।

১১। নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সম্পাদিত "রবি' সাহিত্য পত্র, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ-২৩৫ ।

১২ ।নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সম্পাদিত "রবি' সাহিত্য পত্র, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ-২৩৭ ।

১৩। নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সম্পাদিত ' সাহিত্য পত্র, 'রবি' ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ-২৩৯ ।

১৪। নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সম্পাদিত "রবি' সাহিত্য পত্র, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ-২৩৯ ।

১৫। ঘোষ সুখময় ও চৌধুরী বিকচ সম্পাদি, ‘‘পাঁচ দশকের গল্প’’, ত্রিবেগ প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা,পৃঃ -৫ ।

১৬। ঘোষ সুখময় ও চৌধুরী বিকচ সম্পাদিত, ‘‘পাঁচ দশকের গল্প’’, ত্রিবেগ প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা,,পৃঃ ৬ ।

১৭। ঘোষ সুখময় ও চৌধুরী বিকচ সম্পাদিত, ‘‘পাঁচ দশকের গল্প’’, ত্রিবেগ প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা,,পৃঃ ৬ ।

১৮। ঘোষ সুখময় ও চৌধুরী বিকচ সম্পাদিত, "পাঁচ দশকের গল্প", ত্রিবেগ প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃঃ ৬-৭ ।

১৯। ঘোষ সুখময় ও চৌধুরী বিকচ সম্পাদিত, "পাঁচ দশকের গল্প", ত্রিবেগ প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা,,পৃঃ ৭ ।

২০। নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সম্পাদিত 'রবি' সাহিত্য পত্র, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ।

২১। নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সম্পাদিত 'রবি' সাহিত্য পত্র, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ।

*অতিথি অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, তিনসুকিয়া মহাবিদ্যালয়, আসাম। ই-মেইল : minakshipaul21dec@gmail.co